গ্রহগুলি কেন গোলাকার?

আমাদের সৌরজগতে থাকা সবগুলি গ্রহ একটা অন্যটার চেয়ে আলাদা। সৌরজগতে বৃহস্পতি বা শনির মত কিছু গ্রহ গ্যাস দিয়ে তৈরি, আবার বুধ, পৃথিবী বা শুক্র গ্রহে রয়েছে কঠিন পৃষ্ঠ। কিন্তু যা দিয়েই তৈরি হোক, যে বিষয়টাতে সবগুলি গ্রহের মিল রয়েছে, সেটা হল এগুলির আকৃতি। সকল গ্রহের আকৃতিই গোলাকার।

অন্তত এসব গ্রহের ছবি দেখলে গোলাকার বলেই মনে হয়।

গোলাকার গ্রহ যে শুধু আমাদের সৌরজগতে রয়েছে, তাও কিন্তু না। আমাদের সৌরজগৎ থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে মহাবিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আরো যেসব গ্রহ তারকার চারিপাশে প্রদক্ষিণ করে, সেগুলির আকৃতিও গোলাকার।

সৌরজগতের বাইরে এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৫ হাজার গ্রহ আবিষ্কার করেছে মানুষ, যার মধ্যে সবগুলি গ্রহের আকৃতিই গোলাকার।

কিন্তু কেন এসব গ্রহ গোলাকার? আবার খালি চোখে গোলাকার মনে হলেও এসব গ্রহ কেন নিখুঁত গোলাকার নয়?

এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আগে দুটি বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট করতে হবে: মাধ্যাকর্ষণ এবং গোলকের বৈশিষ্ট্য।
.

মাধ্যাকর্ষণ

ভর রয়েছে, এমন দুটি বস্তুর মধ্যে কাজ করা আকর্ষণ বলের নাম মাধ্যাকর্ষণ। একে মহাকর্ষও বলা হয়। যে বস্তুর ভর যত বেশি, তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও তত বেশি। মহাবিশ্বের সব প্রান্তেই কাজ করে মহাকর্ষ।

এবং যেকোনো গ্রহ গঠনের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মাধ্যাকর্ষণ বল।

গ্রহের গঠন শুরু হয় মহাকাশে থাকা ধূলিকণা একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে। ক্ষুদ্র এসব ধূলিকণা একত্রিত হয়ে পাথরের আকার ধারণ করে। নতুন নতুন ধূলিকণা বা শিলাখন্ড যুক্ত হতে হতে এই পাথরের আকারও বড় হতে থাকে।

নতুন গঠিত কোনো তারকার চারপাশে এ ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পাথর একত্রিত হয়ে আকারে বড় হতে থাকে। এবং এক পর্যায়ে আকারে বড় হওয়া এসব পাথরের সব পাশে চাকতি আকারে ঘন গ্যাস জমা হয়। গ্রহ গঠনের এই পর্যায়কে বলা হয় ‘প্রোটোপ্ল্যানেটারি ডিস্ক’।

এ পর্যায়ে পাথরের সব পাশে গ্যাসের পরিমাণ বাড়তে থাকলে এখানে আরো কঠিন পদার্থ এসে জমা হয়। এবং এসব পদার্থ একে অন্যটার সঙ্গে আরো কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকা শুরু করে। এভাবে সময়ের সাথে সাথে আরো বড় ধরনের কাঠামো তৈরি হতে থাকে। বিজ্ঞানীরা গ্রহ গঠনের এই পর্যায়ের নাম দিয়েছেন ‘প্ল্যানেটেসিমাল’।

কোনো তারকার চারপাশে একাধিক প্ল্যানেটেসিমাল গড়ে উঠতে পারে। এর মধ্যে কিছু প্ল্যানেটেসিমাল বিভিন্ন কারণে ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে। আবার কিছু প্ল্যানেটেসিমাল বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকে যেতে পারে। সময়ের সাথে সাথে এসব প্ল্যানেটেসিমাল থেকেই তৈরি হয় গ্রহ।

তবে প্ল্যানেটেসিমাল থেকে গ্রহ তৈরি হতেও লক্ষ লক্ষ বছর সময় লাগে। দীর্ঘ এই সময়ের মধ্যে এসব সম্ভাব্য গ্রহের আকার বড় হতে থাকে। মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে বড় আকারের এসব গ্রহে আরো ছোট ছোট পাথর বা ধূমকেতু সহ মহাকাশে ভাসতে থাকা অন্যান্য বস্তু এসে জড়ো হতে থাকে।

অর্থাৎ, এসব গ্রহের আকার বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভরও বাড়তে থাকে। এবং আগেই যেমনটা বলা হয়েছে, বস্তুর ভর বেশি হলে তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও বেশি হবে। ফলে অধিক মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে নতুন গঠিত হতে থাকা গ্রহের কেন্দ্রের দিকে এর

সকল উপাদান আকর্ষিত হতে থাকে।

এভাবে গ্রহের আকার এতটাই বড় হয়ে যায় যে, নক্ষত্রের চারপাশে গ্রহটি তার নিজস্ব কক্ষপথ তৈরি করে এবং সেই কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। গ্রহের এই নির্দিষ্ট কক্ষপথে অন্যান্য ছোটখাটো যেসব বস্তুই আসে, মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে গ্রহটি সেসব বস্তু তার নিজের দিকে টেনে নিতে থাকে।

তবে গ্রহ গঠনের এ পর্যায়েও গ্রহের সকল উপাদান একসাথে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। বরং পাথর, শিলা বা ধূমকেতুর মত অনেক উপাদান গ্রহের চারপাশে ভাসমান অবস্থায় থাকে। ভাসমান অবস্থাতেও এসব উপাদানগুলির সঙ্গে গ্রহের কেন্দ্রের আকর্ষণ বল কাজ করে। অর্থাৎ, মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে গ্রহের কেন্দ্র এর চারপাশে থাকা সকল উপাদান নিজের দিকে টানতে থাকে।

এদিকে একটি গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ বল সব দিকে সমানভাবে কাজ করে। ফলে গ্রহ গঠনের সময় এর আশেপাশে থাকা সকল উপাদান প্রথমে কেন্দ্রে গিয়ে জড়ো হয়। এ কারণে গ্রহের কেন্দ্রে উপাদানের ঘনত্ব থাকে সবচেয়ে বেশি।

বিষয়টা আরো সহজে বুঝতে হলে কাগজে আঁকা একটি বৃত্তের কথা কল্পনা করা যায়, যেই বৃত্তের কেন্দ্র থেকে মাধ্যাকর্ষণ বল চারদিকে সমানভাবে কাজ করবে। কাগজের সেই বৃত্তটাই যদি ত্রিমাত্রিক দুনিয়ায় চিন্তা করা যায়, তাহলে সেটা গোলক হিসেবে কল্পনা করা যায়।

এভাবে গ্রহের মতই কোনো বস্তুর কেন্দ্র যদি এর চারপাশে থাকা সব উপাদান সমানভাবে আকর্ষণ করতে থাকে, তাহলে বস্তুটি এক সময় গোলাকার হয়ে আসে।

.

অন্য কোনো আকৃতি না হয়ে গোলাকারই কেন?

ভারসাম্য বজায় রেখে নির্দিষ্ট কোনো স্থানের চারপাশে পদার্থ এসে জমা হতে হতে একটা সময় যে আকৃতি তৈরি হয়, সেটা গোলাকার হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে সবচেয়ে বেশি।

এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যেই কারণটি আগেই বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা হল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এই শক্তি সকল দিকে সমানভাবে কাজ করে। আবার মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে যে গোলাকার বস্তু বা গ্রহ তৈরি হয়, সেটা সহজে বিকৃত হয় না।

উদাহরণ হিসেবে একটা চারকোণা ঘনক বা কিউব আকৃতির গ্রহের কথা চিন্তা করতে পারি। এমন কোনো গ্রহ গঠিত হলে এর প্রতিটা কোণা সংঘর্ষের ঝুঁকিতে থাকে। এতে গ্রহটির কিউব আকৃতি বিকৃত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে।

তুলনামূলকভাবে একটি গোলাকার আকৃতির গ্রহের চারপাশ প্রায় একই রকম হয়। এবং নির্দিষ্ট কোনো স্থান অন্য স্থানের চেয়ে বেশি বিকৃতি বা সংঘর্ষের ঝুঁকিতে থাকে না।

গ্রহের আকৃতি গোলাকার হওয়ার আরেকটি কারণ হল এর আয়তন। নির্দিষ্ট আকারের কোনো পৃষ্ঠে থাকা যেকোনো আকৃতির বস্তুর তুলনায় গোলকের আয়তনই হয় সবচেয়ে বেশি।

অর্থাৎ, আমরা যদি গোলকের মত একই আকারের তবে ভিন্ন আকৃতির গ্রহ চিন্তাও করি, তাহলে সেই গ্রহের আয়তন হবে গোলাকার গ্রহের চেয়ে কম। গ্রহের আকৃতি গোলাকার হওয়ায় এতে আরো বেশি পরিমাণে উপাদান এসে জড়ো হতে পারে।

.

যে কারণে গ্রহের আকৃতি নিখুঁতভাবে গোলাকার নয়

যদিও আমাদের সৌরজগতে থাকা সব গ্রহের আকৃতিই গোলাকার বলে মনে হয়, কিন্তু এর মধ্যে কোনো গ্রহই নিখুঁতভাবে গোলাকার নয়। অবশ্য কিছু গ্রহ অন্য গ্রহের তুলনায় বেশি গোলাকার। কিন্তু এমনটা কেন?

পৃথিবী দিয়েই উদাহরণ দেয়া যায়। আমাদের গ্রহের দুই মেরুর মধ্যকার ব্যাসের মাপ ১২,৭১৪ কিলোমিটার। একে মেরু ব্যাস বলা হয়। এবং নিরক্ষীয় অঞ্চল ধরে পৃথিবীর ব্যাস কল্পনা করা হলে তার মাপ হবে ১২,৭৫৭ কিলোমিটার। একে বলা হয় নিরক্ষীয় ব্যাস।

অর্থাৎ, পৃথিবীর দুই মেরুর মাঝখানের দূরত্ব যদি গ্রহের উলম্ব দিক কল্পনা করা হয় এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলের যেকোনো দুটি প্রান্তের দূরত্ব যদি গ্রহের প্রস্থ হিসেবে ধরা হয়, তাহলে দৈর্ঘ্যের চেয়ে প্রস্থের ব্যাস হবে ৪৩ কিলোমিটার বেশি।

আরেকভাবে বললে, পৃথিবীর মেরু ব্যাস ও নিরক্ষীয় ব্যাসের পার্থক্য হল ৪৩ কিলোমিটার।

এ কারণে প্রায়ই পৃথিবীকে গোলাকার না বলে কমলালেবুর আকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়। নিরক্ষরেখা বরাবর আমাদের সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের মত পৃথিবীও কিছুটা স্ফীত।

পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গল গ্রহ উত্তর-দক্ষিণে আরো কিছুটা চ্যাপ্টা। মঙ্গলের মেরু ব্যাস ও নিরক্ষীয় ব্যাসের পার্থক্য হল ৫০ কিলোমিটার।

তবে পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহের তুলনায় শনি এবং বৃহস্পতি গ্রহ নিরক্ষরেখা বরাবর অনেক বেশি স্ফীত। শনি এবং বৃহস্পতি গ্রহের মেরু ব্যাস ও নিরক্ষীয় ব্যাসের পার্থক্য হল যথাক্রমে ১১,৮০৮ কিলোমিটার এবং ১০,১৭৫ কিলোমিটার।

সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের তুলনায় বুধ এবং শুক্র অনেকটা গোলাকার।

কিন্তু সব গ্রহই নিরক্ষরেখা বরাবর স্ফীত কেন হয়?

গ্রহ নিজের অক্ষের চারপাশে ঘোরার কারণেই মূলত এমনটা হয়।

যখন কোনো বস্তু ঘোরে, তখন এর বাইরের প্রান্তের গতি ভেতরের প্রান্তের চেয়ে দ্রুত হতে হয়। যেকোনো ঘূর্ণায়মান বস্তুর ক্ষেত্রেই কথাটা সত্য। নাগরদোলার মত বড় কিছু থেকে শুরু করে টেবিল ফ্যান কিংবা সিডির মতো ছোট সব ধরনের বস্তুর ক্ষেত্রেই কথাটা খাটে।

প্রতি সেকেন্ডে যেকোনো ঘূর্ণায়মান বস্তুর ভেতরের প্রান্তটি যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে, বাইরের প্রান্তটি তার চেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে।

আর যেকোনো গ্রহ নিজ অক্ষের চারপাশে ঘোরার সময় গ্রহটির নিরক্ষরেখা বরাবর অঞ্চল সবচেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে। এ সময় মাধ্যাকর্ষণ বল গ্রহের প্রতিটা অংশকে একসঙ্গে আটকে রাখার চেষ্টা চালাতে থাকে।

তবে ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তুতে আরো যে একটি বল কাজ করে, সেটার নাম কেন্দ্রবিমুখী বল। এই বলের প্রভাবে বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মান বস্তুর অংশগুলি বৃত্তের বাইরে ছিটকে চলে যায়। যেমন, কেন্দ্রবিমুখী বলের কারণেই চাকা ঘোরার সময় তাতে লেগে থাকা কাদা ছিটকে আসে কিংবা রাস্তায় হঠাৎ বাঁক নেয়ার সময় গাড়ি বা মোটরসাইকেল রাস্তার বাইরে ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

আর কেন্দ্রবিমুখী বল সবচেয়ে বেশি কাজ করে গ্রহের নিরক্ষরেখা বরাবর অঞ্চলে। গ্রহের কেন্দ্র থেকে নিরক্ষরেখার দূরত্ব সবচেয়ে বেশি হওয়াতেই এই অংশটুকুর ওপর কেন্দ্রবিমুখী বলের প্রভাব সবচেয়ে বেশি থাকে।

কোনো গ্রহের নিরক্ষরেখা বরাবর তৈরি হওয়া অতিরিক্ত প্রস্থটুকু বোঝাতে ‘নিরক্ষীয় স্ফীতি’ কথাটা ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীর মেরু ব্যাস ও নিরক্ষীয় ব্যাসের পার্থক্য ৪৩ কিলোমিটার। আরেকভাবে বলা যায়, পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস ১ মিটার হলে

এর নিরক্ষীয় স্ফীতি হবে ১ মিটারের ৩০০ ভাগের ১ ভাগ বা মাত্র ৩ মিলিমিটার।

অর্থাৎ, যদি পৃথিবীকে নিরক্ষরেখা বরাবর ১ মিটার ব্যাসের গোলক হিসেবে কল্পনা করা হয়, তবে পৃথিবীর নিরক্ষীয় স্ফীতি হবে মাত্র ৩ মিলিমিটার। মঙ্গলগ্রহের ক্ষেত্রে নিরক্ষীয় স্ফীতি হবে প্রায় সাড়ে ৬ মিলিমিটার, যা পৃথিবীর দ্বিগুণ।

মজার ব্যাপার, মঙ্গলের মেরু ব্যাস ও নিরক্ষীয় ব্যাসের পার্থক্য পৃথিবীর চেয়ে খুব বেশি না, মাত্র ৭ কিলোমিটার বেশি। অথচ তাতেই মঙ্গলের নিরক্ষীয় স্ফীতি পৃথিবীর চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এর কারণ মঙ্গলগ্রহের আয়তন পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক।

অর্থাৎ, নিরক্ষীয় স্ফীতি পরিমাপের ক্ষেত্রে গ্রহের আকারও অনেক বড় ভূমিকা পালন করে।

যেই আরেকটা বিষয় নিরক্ষীয় স্ফীতি পরিমাপের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল গ্রহের নিজ অক্ষের ওপর ঘূর্ণনের গতি। সাধারণত কোনো গ্রহ নিজ অক্ষের ওপর যত দ্রুতগতিতে ঘোরে, এর নিরক্ষরেখা বরাবর অঞ্চলে কেন্দ্রবিমুখী বলের প্রভাবও তত বেশি হয়।

নিজ অক্ষের ওপর পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি ঘণ্টায় ১৫৭৪ কিলোমিটার। এবং শনি গ্রহের ঘূর্ণন গতি ঘণ্টায় ৩৬,৮৪০ কিলোমিটার। ফলে শনি গ্রহটিকে এর নিরক্ষরেখা বরাবর ১ মিটার ব্যাসের গোলক হিসেবে কল্পনা করা হলে এর নিরক্ষীয় স্ফীতি হবে ১০০ মিলিমিটার। যেখানে পৃথিবীরটা ছিল মাত্র ৩ মিলিমিটার।
.

সংক্ষেপে

এক কথায় বলা যায়, মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাব এবং গোলকের বৈশিষ্ট্যের কারণে গ্রহ সাধারণত গোলাকার হয়ে থাকে। তবে নিজ অক্ষের চারপাশে গ্রহগুলি ঘোরার সময় যে কেন্দ্রবিমুখী বল কাজ করে, তার প্রভাবে গ্রহ নিখুঁতভাবে গোলাকার হয় না। বরং নিরক্ষরেখা বরাবর কিছুটা স্ফীত হয়। সৌঃ সি বি